

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব

ড.নাজনীন সিদ্দিকী

এ শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যার মুখোমুখি হয়েছিলো বাংলাদেশের সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার মানুষ। ২০২২ সালের জুনে এ জেলা দুটির অধিকাংশ মানুষ বন্যার পানিতে আটকে পড়ে। এই দুই জেলায় প্রায় ৩০ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। মানুষকে উদ্ধারে সিলেট এবং সুনামগঞ্জের আটটি উপজেলায় সেনাবাহিনী নামানো হয়েছিলো। বন্যার পানিতে তলিয়ে সুনামগঞ্জ শহর পুরো দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো। জেলার ৭০ হাজারের মতো মানুষ দুইশ বিশটি আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছিলো। সিলেটে ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বন্যার পানি প্রবেশ করায় ফ্লাইট ওঠানামা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো। ওসমানী হাসপাতালে নিচের তলায় পানি ওঠায় চিকিৎসা কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছিলো। রোগীসহ সকল কার্যক্রম উপরের তলায় সরিয়ে নিতে হয়েছিলো। বন্যার কারণে রেল স্টেশনের কার্যক্রম বন্ধ হয়েছিলো। বিদ্যুৎ বিভাট ও টেলিযোগাযোগ বিঘ্নিত হওয়ার কারণে সকল প্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিলো। গত এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় থেকে দেশের অধিকাংশ জেলার ওপর দিয়ে তীব্র থেকে মাঝারি তাপদহ বয়ে যায়। তাপমাত্রা ৪০ থেকে ৪২ ডিগ্রির আশেপাশে, কিন্তু অনুভূত হচ্ছিল ৪৫ ডিগ্রির উপরে। এসবই ঘটছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে।

এ শতাব্দীতে নতুন কিছু পাওয়ার আশায় পৃথিবীর মানুষ। কালের পরিক্রমায় মানুষের এমন চাহিদা অমূলক নয়। কিন্তু সব চাহিদাকে পাশ কাটিয়ে একটি খবরে সরব পৃথিবী। চারিদিকে একটাই আলোচনা, একটাই কথা—‘জলবায়ু পরিবর্তন’। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে হুমকির সম্মুখীন আজ সারা বিশ্ব। এই হুমকি মোকাবিলায় সম্মিলিত প্রচেষ্টার কোনো বিকল্প নেই, এমনটাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা। ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র, রাষ্ট্র থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, সবাইকে একযোগে দাঁড়াতে হবে বিপর্যয় রুখতে। বর্তমানে বাংলাদেশ বৈশ্বিক কার্বন নির্গমনে ০.৫৬ শতাংশ অবদান রাখে, তবু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আমাদের দেশের ক্ষতির অনুপাত অপ্রতিরোধ্য। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, উপকূলীয় ক্ষয়, খরা, তাপ এবং বন্যা—সবই আমাদের অর্থনীতিতে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। আমাদের অবকাঠামো এবং কৃষিশিল্প ধ্বংস হচ্ছে, কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষয়ক্ষতি এবং ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ, হ্রাস ও মোকাবিলায় যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে আমাদের। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, মানবসৃষ্ট উষ্ণায়নের কারণে আমাদের জিডিপি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এবং গড় আয় ২১০০ সালে ৯০ শতাংশ কম হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিবেশ পরিদপ্তর (আইপিসিসি) অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টে ধারণা করা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে দারিদ্র্য প্রায় ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। জলবায়ু তার নিজ অবস্থানে স্থির থাকে না। এটা সর্বদা পরিবর্তনশীল। তাহলে এটা নিয়ে এত মাতামাতি কেন? মাতামাতির কারণ রয়েছে। বিশ্ব জলবায়ুর স্বাভাবিক পরিবর্তন এখন আর দেখা যাচ্ছে না। পরিবর্তনের মাত্রা খুব বেশি। জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সম্পর্কে আশঙ্কা দেশের বৃহৎ অংশ কোনো একসময় সমুদ্রের গর্ভে হারিয়ে যাবে। জলবায়ু পরিবর্তনকে ঘিরে বাংলাদেশ সম্পর্কে এ সংকটের আশঙ্কা অমূলক নয়। তাই ভয়াবহ বাস্তবতার সম্মুখীন হওয়ার আগেই প্রয়োজন প্রতিরোধ।

আমরা যে পরিবেশে বাস করি, সেই পরিবেশের প্রতিটি মুহূর্ত অনন্য। ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরিবর্তিত হতে থাকে সেই পরিবেশের অবস্থা। যেমন: কখনো যদি রোদের তীব্রতা দেখতে পাই তো আবার কখনো মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। এভাবে শীত, বৃষ্টি, গরম, ঝড় প্রভৃতি বায়ুমণ্ডলের অবস্থা পরিবেশকে অনন্য করে তোলে। জলবায়ু হলো দৈনন্দিন আবহাওয়ার দীর্ঘদিনের সাধারণ অবস্থা, গড় আবহাওয়া নয়। জলবায়ুর উপাদানগুলো হলো তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ু, মেঘ, বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, বায়ুচাপ প্রভৃতি। একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক অবস্থা ওই দেশের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর চারটি উপাদান যথা: বায়ুর চাপ, বায়ুর তাপ, বায়ুর আর্দ্রতা ও অধঃক্ষেপণ, ঝড়ঝঞ্ঝা। পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণে বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠে যে চাপ প্রয়োগ করে, তাই বায়ুর চাপ। সমুদ্র সমতলে বায়ুর চাপের পরিমাণ প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে প্রায় ১৪.৭ পাউন্ড। ৪৫ অক্ষাংশের সমুদ্র সমতলে ব্যারোমিটারে এর মাপ ২৯.৯২ ইঞ্চি। সমুদ্রে বায়ুমণ্ডলের ওজন প্রায় ৫ হাজার ৬০০ ট্রিলিয়ন টন। এই বায়ু চাপ পরিবর্তিত হয়ে থাকে বেশ কয়েকটি কারণে, এর মধ্যে অন্যতম তাপ। উষ্ণতার তারতম্যের কারণে বায়ুর চাপ পরিবর্তিত হয়। জলবায়ুর এ উপাদানগুলো পরিবর্তনের কিছু নিয়ামক আছে। সূর্যের কৌণিক অবস্থান জলবায়ুর অন্যতম নিয়ামক। তির্যকভাবে সূর্য আলো দিলে বেশি বায়ুমণ্ডল ভেদ করতে হয়; কিন্তু লম্বভাবে সূর্য কিরণ দিলে তা অনেক বেশি প্রখর হয়, যা বায়ুর তাপের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে থাকে। তাছাড়া ভূপৃষ্ঠের ৭০.৮ শতাংশ পানি এবং ২৯.২ শতাংশ স্থল। সূর্যের তাপ পানির ৬০০ ফুট পর্যন্ত এবং স্থলভাগে ৬০ ফুট পর্যন্ত পৌঁছে। ফলে পানি অনেক বেশি উত্তপ্ত হয় এবং এই উত্তপ্ত পানি এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে গেলে সেই অঞ্চলে উষ্ণতা বৃদ্ধি করে। বায়ুপ্রবাহও জলবায়ুর অন্যতম নিয়ামক, উষ্ণ স্থানের বায়ু শীত অঞ্চলে গেলে সেই অঞ্চলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। আবার শীত অঞ্চলের বায়ু উষ্ণ অঞ্চলে গেলে সেই অঞ্চলের বায়ু শীতল হয়ে ওঠে। এভাবে এ বিষয়গুলো দ্বারা জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর জলবায়ু যে পরিবর্তিত হচ্ছে, এ বিষয়ে আগে কোনো ধারণাই ছিল না। যখন জানা গেল পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন থেকেই মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বেড়ে গেল। বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি প্রথম ধরা পড়ে ১৮ এবং ১৯ শতকে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আমরা প্রথম সতর্কতা সংকেত পাই গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে যখন হাওয়াইতে কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিমাপ করা হয় এবং এর পরবর্তী দশকে সেখানে আবার কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিমাপ করা হয়। সেই পরিমাপে দেখা

যায়, ক্রমান্বয়ে পৃথিবীতে কার্বন ডাইঅক্সাইড বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ধারণাটি আমাদের মাঝে তখন থেকেই তৈরি হয়।

প্রকৃতির ওপর মানুষের নির্যাতনের কারণে জলবায়ু পরিবর্তন দেখা যায়। প্রাকৃতিক কারণে জলবায়ু ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হলেও মানবসৃষ্ট কারণে জলবায়ু খুব দ্রুত পরিবর্তিত হয়। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানবসৃষ্ট কারণকেই মূল কারণ হিসেবে দেখা হয়। মানুষ যে জলবায়ু পরিবর্তন করছে, এ বিষয়ে বেশ শক্ত প্রমাণ আছে। আর এ প্রক্রিয়াটি মানুষ সম্পাদন করছে গ্রিনহাউজ গ্যাস উৎপাদনের মধ্য দিয়ে। বিশেষ করে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং মিথেনের মতো গ্রিনহাউজ গ্যাস উৎপাদন করে। শিল্পবিপ্লব-পরবর্তী ১৫০ বছরের বেশি সময় ধরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ক্রমাগত অধিক হারে শিল্পকারখানা থেকে নির্গত কার্বন ডাইঅক্সাইডসহ বিভিন্ন গ্যাস নির্গমনের ফলে বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ বেড়ে চলেছে, যার জন্য দায়ী মানুষই। কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি, জমি ব্যবহারে পরিবর্তন, বৃক্ষনিধন, বন উজাড়, জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো, মিথেন গ্যাস নির্গমন, কৃষি প্রভৃতি কারণে জলবায়ু পরিবর্তিত হয় (Climate change challenge)। এছাড়াও নদীর নাব্যতা হ্রাস, পানিদূষণ, শব্দদূষণ, তেলদূষণও জলবায়ু পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া ওজোন স্তর ধীরে ধীরে ক্ষয়ে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে প্রবেশে সাহায্য করে থাকে। অতি বেগুনি রশ্মি পৃথিবীর পরিবেশকে নষ্ট তথা জীবের বসবাসের অনুকূল পরিবেশ নষ্ট করে থাকে। এ পরিস্থিতি জলবায়ু পরিবর্তন করে থাকে। কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড মূলত বৃদ্ধি পায় অতিরিক্ত শিল্পকারখানা বৃদ্ধি, গাড়ি, ইট ভাঁটা, নগরায়ণের বিভিন্ন উপকরণ (যেমন: কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমনকারী বিভিন্ন যন্ত্রাংশ) প্রভৃতি কারণে।

এছাড়া রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ পোড়ানোর কারণে প্রচুর পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়। এই রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থগুলো উৎপন্ন হয় বিভিন্ন শিল্পকারখানা থেকে। যেখানে থাকে মানুষের চরম অর্থলালসা। জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে সবচেয়ে বড়ো পদক্ষেপ হলো মানুষকে সচেতন করা। জলবায়ু পরিবর্তিত হয় এমন কাজ না করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিষয়ে সচেতন করা। তবেই জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি প্রশমনের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমানো সম্ভব হবে।

#

পিআইডি ফিচার